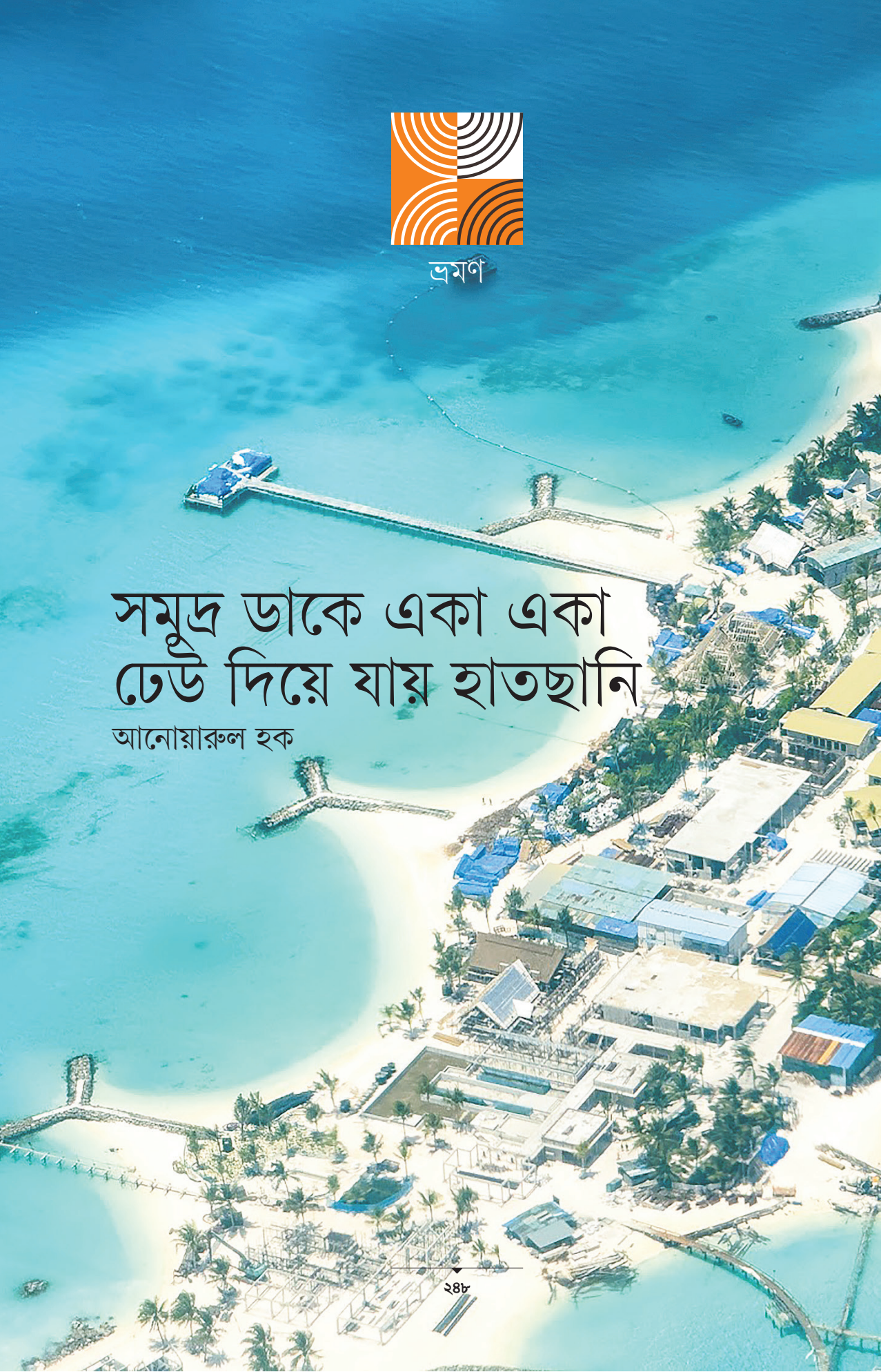

ভ্রমণ

সমুদ্র ডাকে একা একা ঢেউ দিয়ে যায় হাতছানি

আনোয়ারুল হক

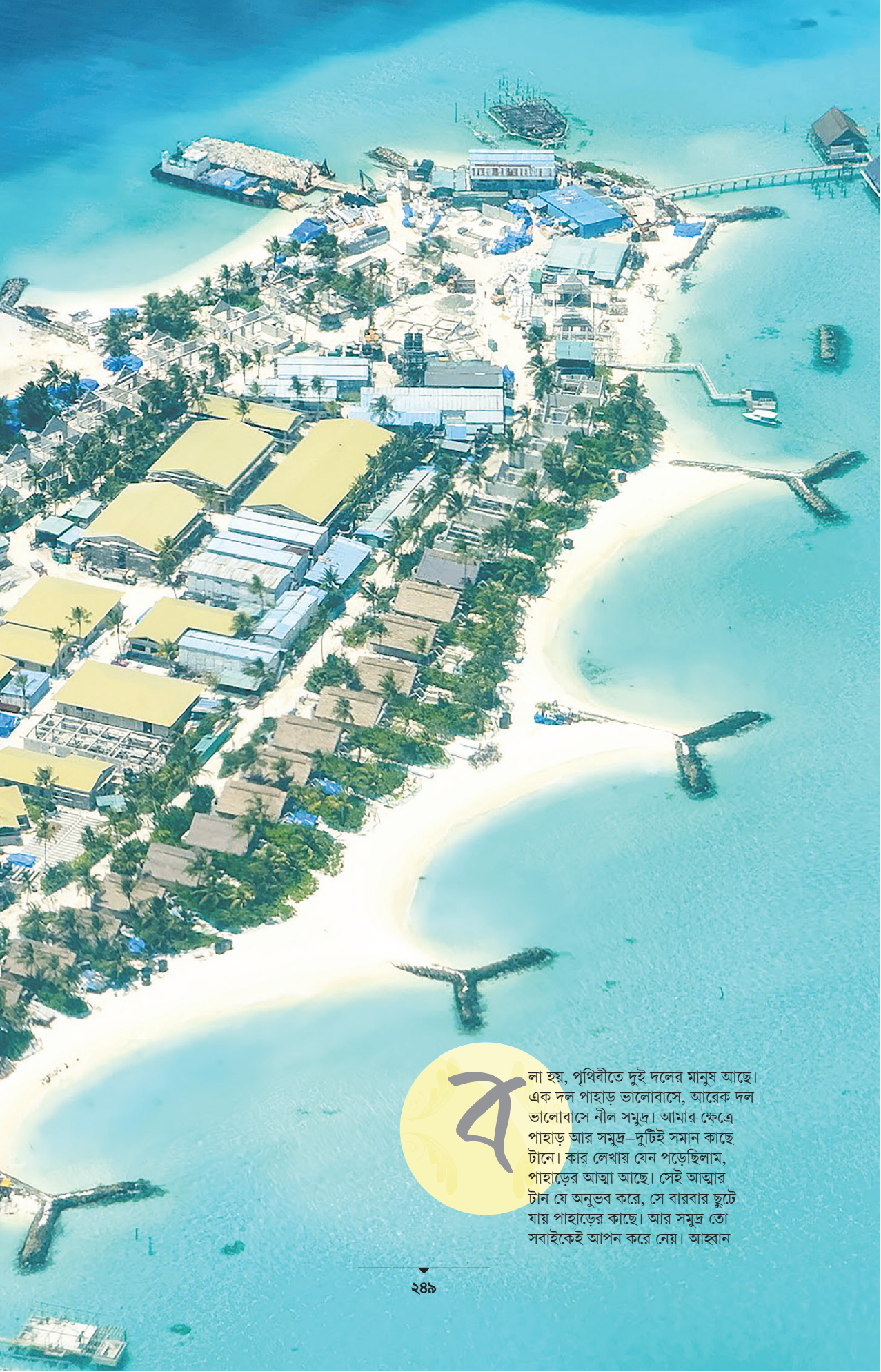

বলা হয়, পৃথিবীতে দুই দলের মানুষ আছে। এক দল পাহাড় ভালোবাসে, আরেক দল ভালোবাসে নীল সমুদ্র। আমার ক্ষেত্রে পাহাড় আর সমুদ্র–দুটিই সমান কাছে টানে। কার লেখায় যেন পড়েছিলাম, পাহাড়ের আত্মা আছে। সেই আত্মার টান যে অনুভব করে, সে বারবার ছুটে যায় পাহাড়ের কাছে। আর সমুদ্র তো সবাইকেই আপন করে নেয়। আহ্বান

জানায় অবগাহনের। অফিস থেকে যখন জানতে পারলাম মালদ্বীপে যেতে হবে একটা কর্মশালায় অংশ নিতে, আমি অনুভব করতে শুরু করলাম নীল সমুদ্রের ডাক। ফেনাময় ঢেউয়ের হাতছানি। দ্বীপের মালায় বিচরণ। প্রথম যেবার মালদ্বীপে গিয়েছিলাম, সেবার শ্রীলঙ্কা হয়ে সেখানে যেতে হয়েছিল। এবার অবশ্য ইউএস-বাংলার সরাসরি ফ্লাইটেই ঢাকা থেকে রাজধানী মালেতে যাওয়া গেল। যেতে সময় লাগল চার ঘণ্টা।

সকালের ফ্লাইটে রওনা দেওয়ায় এবার আকাশ আর মেঘের নানা রূপ দেখার সৌভাগ্য হলো। আকাশ ছিল ঝকঝকে। তার চেয়েও বড় কথা, ফেব্রুয়ারির আকাশেও পেঁজা তুলার মতো ভেসে বেড়ানো মেঘের দেখা মিলল। এ যেন শরতের আকাশ। সাধারণত আমি জানালার পাশের সিটে বসি না। কিন্তু এবারের সিটটা পেয়েছিলাম জানালার পাশেই। ফলে নীল আকাশে সাদা মেঘের নানা কম্বিনেশন দেখার সুযোগ মিলল। বিশাল ক্যানভাসে মহান চিত্রকরের আঁকা জলরঙের কাজ আমি উপভোগ করতে থাকলাম বিমানের জানালার ফ্রেমে। মাঝে মাঝে মনে হলো, সাদা মেঘগুলোর মতো আমাদের বিমানটাও একটা ভেলা। কবিগুরুর কবিতার চরণগুলো মনে এলো: নীল আকাশে কে ভাসালে/ সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই—লুকোচুরি খেলা।

মেঘের দেশে ঘুরতে ঘুরতে দ্রুতই যেন চার ঘণ্টা কেটে গেল। বিমানের পাইলটের ঘোষণা এল, ২০ মিনিটের মধ্যেই আমরা মালে বিমানবন্দরে অবতরণ করব। তবে তিনি সাবধান করলেন, বিমান অবতরণের সময় সমুদ্রের বাতাসের ধাক্কার কারণে খানিকটা ঝাঁকি অনুভব হতে পারে। পাইলটের মুখে এ কথা শুনলে একটু ভয় তো লাগেই। সেই ভয় কেটে গেল জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে। মালদ্বীপের সৌন্দর্য যে দেখা যাচ্ছে নানাভাবে। নীল সমুদ্র আর সঙ্গে ছেঁড়া দ্বীপের অ্যারিয়াল ভিউ। ওপর থেকে দেখা ব্লু লেগুনের রূপ। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। হাতে ছিল অল্প কিছুদিন আগে কেনা আইফোন ১৫প্রো। আমি চেষ্টা করলাম সেটা দিয়েই দৃশ্যগুলো ধরার। আইফোনের নতুন ভার্সনের ক্যামেরা মনে হয় সত্যিই ভালো। বেশ কিছু সুন্দর ছবি তুলে ফেললাম বিমান থেকেই। মালের বিমানবন্দর এমনিতেই সুন্দর। বিমান নামার সময় মনে হয় যেন সমুদ্রের মাঝে নেমে পড়ছি। বিশেষ প্রযুক্তি খাটিয়ে সমুদ্র থেকেই নাকি উত্থান ঘটানো হয়েছে বিমানবন্দরের জমির। এবার আকাশ পরিষ্কার থাকায় বিমান থেকেই মালদ্বীপের যে রূপ দেখেছি, তা এক কথায় অদ্বিতীয়। আমাদের বিমান মাটিতে অবতরণ করল স্বাভাবিকভাবেই।

আকাশপথে সুন্দর সময় কাটিয়ে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই বিমান থেকে নামলাম। এবার ইমিগ্রেশনের পালা। যথারীতি সেখানে লম্বা লাইন। বেশ কয়েকটা ফ্লাইট একসঙ্গে নেমেছে। তবে সঙ্গে ইউএন পাসপোর্ট থাকায় আলাদা লাইনে সহজেই পৌঁছানো গেল ইমিগ্রেশনে। কর্মশালার আমন্ত্রণপত্র দেখানোর পরও যখন দেখলাম ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা ইতস্তত করছেন, আমি জানতে চাইলাম কোনো সমস্যা হয়েছে কি না। কর্মকর্তা জানতে চাইলেন, কোন হোটেলে থাকব। গেস্টহাউসের নাম 'জেন ডেন' শুনেই তিনি পাসপোর্টে সিল মেরে দিলেন। ধারণা করলাম, আমার নাম যেহেতু কর্মশালার ভেন্যু যে হোটেলে, সেই গেস্ট তালিকায় নেই, তিনি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না আমি এই কর্মশালার আমন্ত্রিত অতিথি কি না। ভালো লাগল এটা দেখে, এদের পর্যটন ব্যবস্থাটা আমাদের দেশের

মতো ছেড়ে দেওয়া নয়। বরং বেশ গোছানো। কোন দ্বীপে কয়জন অতিথি থাকছেন, সে হিসাব বিমানবন্দরেই রাখা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বন্ধের দিন যাঁরা কক্সবাজারে গেছেন, তাঁরা জানেন সেখানে কত সংখ্যক পর্যটকের আগমন ঘটে। সামর্থ্যের তুলনায় অনেক বেশি পর্যটকের আগমন মানেই অব্যবস্থা আর ভোগান্তি। সেদিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো পর্যটন ব্যবস্থা বোধ হয় ভুটানের। সেখানে হোটেলগুলোর সামর্থ্যের বাইরে কোনো পর্যটককেই ঢুকতে দেওয়া হয় না। মালদ্বীপের পর্যটন ব্যবস্থাপনাও আমার ভালো লাগল।

ইমিগ্রেশন পার হয়ে এবার লাগেজ সংগ্রহের পালা। যদিও লাগেজে প্রায়োরিটি ট্যাগ লাগানো, যথারীতি আমার ব্যাগ এল সবার শেষে। এসবে অবশ্য আমি অভ্যস্ত। কেন সব সময় আমার লাগেজই আসতে হবে দেরিতে, তা নিয়ে একটা বড় গবেষণা করা যেতে পারে। বাইরে বেরিয়ে দেখি আমাদের মালদ্বীপ অফিসের সহকর্মী লালা দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জানালেন, আমাদের যেহেতু বের হতে দেরি হয়েছে, যে শাটল বোটে করে আমাদের থুলুসদু নামের দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হবে, সেটা অন্য যাত্রীদের নিয়ে চলে গেছে। পরবর্তী শাটল আসবে বেলা সাড়ে ৩টায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, তখন সময় বেলা ১টা বেজে ৫ মিনিট। মানে পাক্কা ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। কী আর করা! সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কী ভয়? লালা তখন আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন বাংলাদেশ থেকে আসা আইসিটি ডিভিশনের কর্মকর্তা জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে। তিনিও ইউএস-বাংলার ফ্লাইটে ঢাকা থেকে এসেছেন। আমি ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁকে খুঁজেছি। দেখা পাই নাই। অথচ তিনি নাকি আমার পেছনের সিটে বসেই মালে এলেন। বিমানবন্দরের গেটের বাইরে বেশ গরম। লালা বুদ্ধি দিলেন, বাইরে না বের হয়ে কফিশপ-টপে ঘুরে সময় কাটাতে। আমাদের শাটলের নাম ‘রেফ-কুল এক্সপ্রেস’। ঠিক সাড়ে ৩টাতেই এটা বিমানবন্দরের সঙ্গে লাগোয়া ঘাটে ভিড়বে। তিনি আমাদের ঘাটের কোথায় শাটল বোটটা ভিড়বে, সেটাও দেখিয়ে দিলেন।

আমার কাছে মালে বিমানবন্দরটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর একটা বলে মনে হয়। ছোট্ট বিমানবন্দর। অল্প কিছু খাবারদাবারের দোকানপাট ছাড়া তেমন কিছুই নেই। কিন্তু গেট থেকে বেরোলেই নীল সমুদ্র। বিমানবন্দরের সঙ্গেই ছিমছাম জেটি। সেখান থেকে শাটল বোটে করে পর্যটকেরা যাচ্ছেন তাঁদের গন্তব্যে। ট্যাক্সিও রয়েছে। যাঁরা মালে শহরে যাবেন, তাঁরা গাড়িতে করে যেতে পারেন। বিমানবন্দরে নেমে ট্যাক্সি খোঁজা মানুষ আমরা। আর মালেতে নেমে খুঁজছি নৌকা। বিশ্বের কয়টি বিমানবন্দরে আমাদের এ অভিজ্ঞতা হয়? আমরা কিছুক্ষণ পাটাতনে দাঁড়ালাম। রোদটা একটু চড়া। তাপমাত্রাও ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। তবে সমুদ্র থেকে দমকা বাতাস আসছে। মনে হয় এই বাতাসের কথাই অবতরণের আগে আমাদের পাইলট সাহেব বলেছিলেন। গরমটা তেমন কষ্টকর নয়। পাটাতন থেকে সি-প্লেন ওড়া-নামার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সংখ্যায়ও অনেক। বোঝা গেল সি-প্লেনে করেও অনেকে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছান। টাকার বিনিময়ে সি-

প্লেনে করেও পর্যটকেরা বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরতে পারেন কয়েক দিনের প্যাকেজ ট্যুরে।

লালা বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমরা দুই বাংলাদেশি ভাই বুঝে ফেললাম নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদেরই করতে হবে। জিয়া ভাই বললেন, এয়ারপোর্টে নিশ্চয়ই লাউঞ্জ আছে। ওখানে রেস্ট নিয়ে আমরা শাটল ধরতে পারব। আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। থুলুসদু পৌঁছানোর পর সূর্যাস্তের দেখা পাব তো। মালদ্বীপে ল্যান্ডস্কেপ ছবি তোলার কোনো সুযোগই মিস করতে চাই না। তা ছাড়া আগের অভিজ্ঞতা বলে, অফিসের কর্মশালা শুরু হলে ছবি তোলার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না। টুকরো টুকরো মেঘ ছড়ানো পরিষ্কার আকাশ আর নীল সমুদ্র। এমন কম্বিনেশন তো সব সময় মেলে না। লাউঞ্জে ঢুকেই ওয়াই-ফাই কানেক্ট করে আগে লুবনাকে পৌঁছানোর খবর দিলাম। এরপর মোবাইল ফোনে অফিস মেইল চেক করতে করতেই বেশ সময় কেটে গেল। লাঞ্চ করার জন্য দুজন যখন বুফে টেবিলের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন সার্ভিস পার্সনরা দিলেন দিনের দ্বিতীয় দুঃসংবাদ। বেলা ২টার পর বুফে ক্লোসড। আমরা বললাম, ঠিক আছে, স্ন্যাকস হলেই চলবে। কর্মীরা বললেন, সরি স্যার। পরবর্তী স্ন্যাকস দেওয়া হবে সাড়ে ৩টায়। কফি ছাড়া আর কিছুই নেই। ভাগ্যিস, ইউএস-বাংলা ফ্লাইটে খিচুড়ির সঙ্গে গরুর গোশত পরিবেশন করা হয়েছিল। ফ্লাইটে সেই খাবার দেখে বিরক্ত হয়েছিলাম। সকাল সকাল ভারী খাবার, কোনো মানে হয়! সেই খাবার আর কফি আমাদের সারাটা দিন পার করতে সাহায্য করল। পুরোনো শিক্ষা নতুন করে হলো। সব সময় খাওয়ার আগে আর মারামারির পরে থাকতে হয়। লাউঞ্জে ঢুকেই আমরা খাওয়াদাওয়াটা সেরে ফেলতে পারতাম।

বেলা ৩টা ২৫ মিনিটে আমরা জেটিতে এসে দাঁড়ালাম। শাটল বোট আমাদের নেওয়ার জন্য সময়মতো হাজির হলো। ছিমছাম মাঝারি সাইজের বোট। মালে এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের নিয়ে থুলুসদু দ্বীপের দিকে ছুটল 'রেফ-কুল'। কূল ছাড়িয়ে আমরা ছুটে চললাম নীল সমুদ্রকে আলিঙ্গন করে। প্রায় ১ হাজার ২০০ দ্বীপের দেশ মালদ্বীপের সৌন্দর্য অসাধারণ। সারা বিশ্বে শুধু ফিলিপাইনেই এর চেয়ে বেশি দ্বীপ রয়েছে। এই দ্বীপগুলোর মধ্যে মাত্র ২০০ দ্বীপে মানুষ বসবাস করে। বাকিগুলো খালিই পড়ে আছে। বলা হয়, মালদ্বীপ নামটা সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। 'মালা' আর 'দ্বীপা' এই দুই শব্দের সমন্বয়েই তো মালদ্বীপ। ১ হাজার ২০০ দ্বীপ কিন্তু গলার মালার মতোই জড়িয়ে আছে দেশটির চারদিকে। মালদ্বীপের ম্যাপের দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। সে বিবেচনায় নামকরণের সার্থকতা আছে বলতে হবে। দেশটির মোট আয়তন ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে স্থলভাগ হলো মাত্র ২৯৮ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৫ লাখ ১৫ হাজার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা মাত্র দেড় মিটার। সর্বোচ্চ উচ্চতা ২ দশমিক ৪ মিটার। পৃথিবীতে এর চেয়ে নিচু দেশ আর নেই। সে কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি হলো মালদ্বীপ। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যে হারে বাড়ছে, ১০০ বছর পর হয়তো পুরো দেশই তলিয়ে যাবে সাগরের নিচে। শুনেছিলাম, মালদ্বীপ

সরকার নাকি অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্রস্তাব করেছে সেখানে জমি কেনার। দেশ তলিয়ে গেলে মালদ্বীপবাসী সেখানে বসবাস শুরু করবে। পুরো বিশ্ব একসঙ্গে কাজ না করলে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ঠেকানো যাবে না। শুধু মালদ্বীপ নয়, পুরো বিশ্বই পড়বে মহা সংকটের মধ্যে। জাতিসংঘ মহাসচিব অবশ্য বলছেন, বর্তমানেই বিশ্ব মহা সংকটের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এখনই অ্যাকশনে না গেলে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

বোট ছুটে চলেছে বেশ জোরেই। সমুদ্রে বাতাস আর ঢেউ–দুটোই ছিল। মাঝে মাঝে বোটটা একটু রোলিংও করছিল। এর মধ্যেই আমাদের চালক সুদক্ষভাবে বোটটা চালিয়ে নিয়ে গেলেন। টানা ৪৫ মিনিট চলার পরে আমরা থুলুসদু দ্বীপের জেটিতে পৌঁছালাম। মালে বিমানবন্দর থেকে এই দ্বীপের দূরত্ব ২৩ কিলোমিটার।

থুলুসদু একটা ছোট্ট দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে ১ দশমিক ৫৮ কিলোমিটার আর প্রস্থে শূন্য দশমিক ৬৮ কিলোমিটার। মোট জমি ৩৩ হেক্টর। দ্বীপে ১ হাজার ২০০ মানুষ বাস করে। ভিড়ভাট্টাহীন ছিমছাম এমন দ্বীপে ঢুকেই মন ভালো হয়ে যায়। কয়েকটা হোটেল আর বেশ কিছু গেস্টহাউস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দ্বীপজুড়ে। আমার থাকার জায়গা 'জেন ডেন' আসলে ছোট্ট একটা গেস্টহাউস। স্থানীয় এক তরুণ তাঁর স্ত্রীসহ এটি পরিচালনা করেন। সময়ক্ষেপণ না করে আমি আমার জন্য নির্ধারিত কক্ষে লাগেজ রেখে ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। স্থানীয় একজনের কাছে জেনে নিলাম সূর্যাস্ত উপভোগ করার সবচেয়ে ভালো জায়গাটার অবস্থান। বালির রাস্তা ধরে টানা আধা ঘণ্টা হাঁটার পর খুঁজে পেলাম সেই সুন্দর জায়গাটা। হঠাৎ করেই সাদা বালির একটা বিচ ঢুকে গেছে সমুদ্রের ভেতরে। ঢোকার পথে কিছু গাছপালা আর ঝোপঝাড়। দুটি খেজুরগাছ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। যেন গাছ দুটিও ওই জায়গা বেছে নিয়েছে ভারত মহাসাগরের কোলে প্রতিদিন সূর্য ডোবা দেখবে বলে। জায়গাটাতে প্রথমবারের মতো গোটা পনেরো লোকের সমাগম দেখতে পেলাম। সবাই সূর্যাস্ত উপভোগ করছে। ছেলেমেয়েসহ কেউ কেউ সাগরের নীল পানিতে গা এলিয়ে দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। তবে চিৎকার-চেঁচামেচি নেই, নেই উচ্চ শব্দে গান বাজানোর ঘটনা। আমি বিচের মাথা পর্যন্ত গিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মেঘ আর সূর্যের লুকোচুরির মধ্যেই আরেকটা দিনের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। আর সাগর অপেক্ষা করছে কখন সূর্য ডুব দেবে তার জলে। সলিলসমাধি ঘটবে আরেকটা দিনের। এ রকম সময় হতবিহ্বল হয়ে সৌন্দর্য আর সময় উপভোগ করতেই আমার ভালো লাগে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। থতমত আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সমুদ্রের দিকে আর গুনগুন করে গাইলাম প্রিয় গায়ক কবীর সুমনের গানখানা:

সমুদ্র ডাকে একা একা, ঢেউ দিয়ে যায় হাতছানি
ফেনায় ফেনায় ভেসে আসে জলপরিদের কানাকানি।
সমুদ্র ডাকে একা একা
তুমিও কি ভেসে যেতে চাও দোলায় দোলায় বহুদূর
শুনো তবে সাগরের গান, শুনো আরেকটি সুর।
সৈকতে ভেঙে পড়ে ঢেউ, বালিতে লুটিয়ে পড়ে জল
কার আহ্বানে ছুটে আসে, সীমাহীন গভীর অতল...।

সন্ধ্যা নেমে এলে আমি ক্যামেরা আর লেন্স গুছিয়ে ফেরার পথ ধরলাম।

মহাকালের বিবেচনায় একটা দিনের পরিসমাপ্তি শুধুই একটা নিয়ম পালন। কিন্তু এ রকম একটা মুহূর্ত আমার মতো মানুষের সারা জীবনের স্মৃতি। যত দিন বেঁচে থাকব থুলুসাঢুর সূর্যাস্তের কথা মনে থাকবে। হয়তো যতবার যেখানেই সূর্যাস্ত দেখব, মনে পড়বে এই বিকেলের কথা। স্মৃতিরাই বেঁচে থাকে, স্মৃতিরাই বাঁচিয়ে রাখে।

কর্মশালার ব্যস্ততার কারণে পরের দুই দিন আর সূর্যাস্ত দেখা হয়নি। তবে দুদিনই ভোরবেলা বেরিয়েছিলাম সূর্যোদয় দেখব বলে। আমার গেস্টহাউসের কাছেই ছিল একটা ছোট সোয়াম্প ফরেস্ট। একটা কাঠের সাঁকো পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। নির্জন পরিবেশ। অনেকটা বিভূতিভূষণের বইয়ে পড়া প্রকৃতির মতো। সেই ছোট বনভূমির পরেই দিগন্তবিস্তৃত ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে সূর্য ওঠার দৃশ্যটাও নয়নাভিরাম। প্রকৃতি যেন সব উজাড় করে বসে আছে। যারা ইয়োগা করেন, তাঁদের জন্য দারুণ একটা জায়গা। নির্জন আর নিশ্চুপ এ রকম জায়গায় প্রকৃতিই মনকে স্থির করতে সহযোগিতা করে। দারুণ এক ভালো লাগা নিয়ে প্রতিটা দিন শুরু করেছিলাম থুলুসাঢু দ্বীপে।

মালদ্বীপের জীববৈচিত্র্যের কিছুটা হলেও ধরতে পেরেছিলাম থুলুসাঢু দ্বীপে। দেখা মিলেছিল অন্তত তিন প্রজাতির বকের। সারা দিন ধরে শুনেছি কোকিলের ডাক। ভোরে গাছের ডালের ফাঁকে এদের দেখাও মিলেছে। শালিকেরও দেখা মিলেছে। সৈকতে দেখা মিলেছে কয়েক প্রজাতির কাঁকড়ার। পথের ধারে দেখেছি গিরগিটিদের। সারা দ্বীপেই দেখা মিলেছে বিড়ালের। বিশেষ করে সকালে দেখেছি এদের আড়মোড়া ভাঙার নানা ভঙ্গি। ক্যামেরায় এসব কিছুই ধরতে পারা গেছে বলে একধরনের তৃপ্তিও আছে। তবে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ না মেলায় একধরনের অতৃপ্তি রয়েই গেছে। শুধু জেনেছি, এদের প্রধান পেশা মাছ ধরা আর প্রধান উপার্জনের খাত পর্যটন। থুলুসাঢুর পরিবেশটা বেশ ভালো। পুরো পর্যটনটাই কমিউনিটিভিত্তিক ট্যুরিজমের আদলে সাজানো। ফলে বাণিজ্যিক ভাবটা নেই, বরং স্বাভাবিক পরিবেশটা রয়েছে। এখানে থাকলে মনে হয়, একটা কমিউনিটির মধ্যেই আছি। আবার যদি কখনো থুলুসাঢুতে বা মালদ্বীপে ফিরি, সেবার স্থানীয় সংস্কৃতি আর জীবনযাপনটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব।

মালদ্বীপ ভ্রমণের আরেকটা বড় আনন্দ হলো, এ দেশে কাজ করতে আসা বাংলাদেশিদের সঙ্গে নানা ধরনের কথোপকথন। বিমানবন্দর, হোটেল, বোট বা রাস্তাঘাট—সবখানেই বাংলাদেশিদের দেখা পাবেন। কথাবার্তা শুনে মনে হয়, তাঁরা ভালোই আছেন এখানে। থুলুসাঢু দ্বীপে কোকা-কোলার একটা ফ্যাক্টরি আছে। সেখানে প্রায় ২০০ বাংলাদেশি কাজ করেন। যে হোটেলে আমাদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো, সে হোটেলে দুজন বাংলাদেশি রয়েছেন। প্রতি মাসে তাঁরা গড়ে এক হাজার ডলারের মতো সঞ্চয় করতে পারেন। বছরে এক মাস ছুটি। কোম্পানিই দেশে যাওয়া-আসার বিমান ভাড়া বহন করে। 'রেফ-কুল' বোটেও একজন বাংলাদেশির দেখা মিলল। তিনি অবশ্য মাসে ৫০০ ডলার সঞ্চয় করতে পারেন। কারও বাড়ি কুমিল্লা, কারও বাড়ি বরিশাল, কারও বাড়ি জামালপুর এবং কারও বাড়ি সিরাজগঞ্জ। সবাই এসেছেন ভাগ্য বদলানোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে। বিদেশে থেকে কঠোর পরিশ্রম করে তাঁরা সঞ্চয় করছেন প্রিয় মানুষগুলোর মুখে হাসি দেখবেন বলে। দেশ ছেড়েছেন কেন, এর উত্তরে সবাই বলেছেন, দেশে কাজ পাওয়া অনেক কঠিন। কাজের সুযোগ তৈরি যে আমাদের অর্থনীতির জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ, মালদ্বীপে কাজ করতে আসা বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা বললে সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

'জেন ডেন'-এ থাকার কারণে আমি প্রতিদিন মালদিভিয়ান স্টাইলে নাশতা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। হালকা তেলে ভাজা রুমালি রুটির মালদিভিয়ান ভার্সন, সঙ্গে পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে মাখানো সেদ্ধ করা ভেটকি মাছ আর ডিম ভাজি। নাশতাটাও আমি দারুণ উপভোগ করেছি। বাই দ্য ওয়ে, 'জেন ডেন'-এর মূল বাবুর্চিও বাংলাদেশি। একজন নেপালি তাঁর সহযোগী। ফলে বাংলাদেশ সারা সফরে আমার সঙ্গেই ছিল।

তিন রাত থাকার পর আমাদের বিদায় নেওয়ার পালা। 'রেফ-কুল' শাটল বোটে করেই আমরা ফিরলাম মালে বিমানবন্দরে। নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো সমুদ্রের একাকী ডাক শুনতে পেলাম। শুনতে পেলাম জলপরিদের কানাকানি। মনে মনে বললাম, আবার ফিরব মালদ্বীপ, আবার ফিরব থুলুসাঢু। ▶